Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 378–388
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : ভৌতিক গল্পের এক অনবদ্য কারিগর

প্রতাপ চন্দ্র দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : pratapchandradas239@gmail.com

Keyword
অলৌকিক, পাঁচ মুন্ডির আসর, অমর-ধাম, পিছনের জানলা

Abstract
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ এবং বিদেশের নানা অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে একের পর এক বৈচিত্র্যময় ভয়ের কাহিনিগুলি রচনা করেছেন। এই কাহিনিগুলির মধ্যে রয়েছে ভৌতিক, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত তথা পারলৌকিক ব্যাখ্যাতীত গল্প। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ভয়ের পরিবেশ নির্মাণে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট ভূতেরা কখনো একক ভাবে, কখনো দলবদ্ধ ভাবে আবার কখনো জড়বস্তুর আকারে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির কারুকার্যময় বর্ণনা তাঁর ভৌতিক গল্পগুলিকে অন্য এক জগতে নিয়ে গেছে। তিনি 'গোয়েন্দা ও প্রেতাত্মা' গল্পটিতে সৃষ্টি করেছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো পারিজাত বক্সীকে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভৌতিক গল্পগুলির প্লট নির্বাচনে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

Discussion
বাংলা সাহিত্যে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় একজন বহুমুখী প্রতিভাধর সাহিত্যিক। তিনি ছোটগল্প, রহস্য কাহিনি, ভৌতিক গল্প, রম্যরচনা এবং উপন্যাস রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। জন্মের কয়েক বছর পরে তিনি চলে আসেন বর্মায়। সে দেশেই তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূচনা। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে রেঙ্গুন কোর্টে আইনজীবীর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। বার্মায় কাটে দীর্ঘ পঁচিশ বছর। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বার্মা থেকে ফিরে আসেন কলকাতায় ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতে। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল- 'ইরাবতী', 'আরাকান', 'উপকূল', 'অভিষেক' ইত্যাদি। উক্ত চারটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল বর্মার অধিবাসীদের জীবন, জীবিকা ও দৈনন্দিন যাপনের ইতিহাস। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ 'ভয়ের মুখোশ' ও 'পাথরের চোখ'। তাঁর রচিত সাহিত্য থেকে বাংলায় 'অভিসারিকা', 'অশান্ত ঘূর্ণি', 'জি টি রোড' আর হিন্দিতে 'মুঠঠি ভর চাউল' সিনেমাগুলি তৈরি হয়েছে। হরিনারায়ণ বেতার নাটকে অভিনয় করতেন। কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য জনপ্রিয় রম্য নাটক তাঁর লেখা। ১৯৪৯ সালের চলচ্চিত্র 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এ তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর

ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এছাড়াও হরিনারায়ণ লিখেছেন শ্যামাসংগীত এবং আবৃত্তিতে পেয়েছেন অনেক মেডেল। সমগ্র জীবনের সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭২ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' এবং ১৯৭৬ সালে 'তারাশঙ্কর' পুরস্কার' লাভ করেন।

ছোটবেলায় ভূতের গল্প শোনেনি বা পড়েনি, এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া ভার। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা সাহিত্যে ভূত বিষয়ক রচনা একটি বিশেষ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পুরনো কিংবা আধুনিক রূপকথায়, এমন কি আমাদের মহাকাব্য-ধর্মগ্রন্থ গুলিতেও ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাসমতে, যেসব আত্মা পরলোকে শান্তি পায় না বা যারা অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন- তাদের আত্মা দুনিয়ায় ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ভারতীয় লোকাচারে প্রচলিত বিশ্বাস হল, শুধু মানুষ নয়- অন্য প্রাণীও মৃত্যুর পরে ভূতে পরিণত হতে পারে।

ছোটগল্পের ধারায় একটি বিশিষ্ট শাখা হল- ভৌতিক গল্প। পাশ্চাত্য সাহিত্য ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্প একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এমন কোন স্রষ্টা বোধহয় নেই, যিনি ভূত নিয়ে বা ভৌতিক পটভূমি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেননি। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা হলেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা ইত্যাদি), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভৌতিক পালঙ্ক, আরক, পৈতৃক ভিটা ইত্যাদি), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেতপুরী, বহুরূপী, দেহান্তর ইত্যাদি), প্রেমেন্দ্র মিত্র (গল্পের শেষে, মাঝরাতের কল, মাহুরী কুঠিতে একরাত ইত্যাদি), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (অতৃপ্ত, নজর, রহস্য ইত্যাদি), লীলা মজুমদার (পেনেটিতে, ছায়া, মোটেল ইত্যাদি), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (মোতিবিবির দরগা, নিঝুমরাতের আতঙ্ক, ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি) প্রমুখেরা।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা রোমাঞ্চকর, রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে এক একটি ভয়ঙ্কর ভূতের কাহিনি রচনা করেছেন। সমকালীন সমাজ জীবনের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর ভৌতিক গল্পগিলিতে। ভূত-প্রেত সম্পর্কে গ্রামে-শহরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ভাবনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর সৃষ্ট ভূতেরা সিংহভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের চরিত্র তথা পাঠকদের কাছে বীভৎস- ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় ভৌতিকগল্প রচনায় হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের দিকটি আলোচনা করা হবে।

'অলৌকিক' গল্পটিতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় দিনে-দুপুরে এক গুজরাটি অফিসে (জেনারাল ট্রেডিং কোম্পানি) প্রেতাত্মার আগমন ঘটিয়েছেন। অফিসের কর্মচারী প্যারেক কর্মরত অবস্থায় হার্ট অ্যাটাকে মারা যান কিন্তু তাঁর আত্মা অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি। গল্পকথক বি কম পাশ করার পর নানা চেষ্টা করেও চাকরি যোগাড় করতে না পেরে অবশেষে উক্ত অফিসটিতে মৃত প্যারেকের জায়গায় চাকরি পান। কিন্তু প্রথম দিনই চেয়ারে বসতে গিয়ে বুঝতে পারেন- আগে থেকেই চেয়ারে কেউ বসে রয়েছে। লেখকের ভাষায়,

> "আমি চেয়ারে বসতে গিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়লাম। কে যেন চেয়ারে বসে রয়েছে। আমি তার কোলের ওপর বসে পড়েছি। উঠে দাঁড়িয়েই আশ্চর্য হলাম। চেয়ার খালি। কেউ তো নেই। তবে! বুঝতে পারলাম আমারই ভুল। চাকরি পাবার আনন্দে মাথার গোলমাল হল নাকি! আবার চেয়ারে বসলাম। এক ব্যাপার। কিন্তু এবার আর আমি উঠলাম না। চেপে বসে রইলাম। স্পষ্ট দেখলাম আশপাশে দাঁড়ানো গুজরাটি বাবুদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।"[১]

উক্ত ঘটনার পর দিন ছয়েক কথক আর অলৌকিক কিছু অনুভব করেননি। তারপর হঠাৎ একদিন মাথা নীচু করে কাজ করতে করতে দেখেন, টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটি শূন্যে উঠে একটু কাত হয়ে অর্ধেকের বেশী জল শেষ হয়ে যায়। এই অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে কথকের মেরুদন্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়- সাথে বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয়। লেজারে দাগ দেওয়ার জন্য লাল পেনসিলটা তুলতে গিয়েই কথক হাত সরিয়ে নেন- পরিস্কার বুঝতে পারেন আগে থেকেই কেউ পেনসিলটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। অফিস ছুটির পর কথক সমস্ত ঘটনাটি মানুভাই নামক এক কর্মচারীকে বললে,তিনি জানান-

> "...প্যারেক এখনও অফিসের মায়া কাটাতে পারেনি। কী করেই বা পারবে, লোকটার অফিস অন্ত প্রাণ ছিল। রোজ আটটা ন-টা পর্যন্ত অফিসে বসে থাকত।"[২]

প্যারেকের প্রেতাত্মা কথককে প্রথম দিন থেকে নিজের উপস্থিতি জানাতে থাকে- হয়তো কথককে সেখান থেকে চলে যেতে ঈঙ্গিত করে। কিন্তু কথক এত কষ্টে সংগ্রহ করা চাকরি ছাড়তে চাননি, তাছাড়া প্যারেকের প্রেতাত্মা তার কোন অনিষ্ট করছে না– ভেবে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু এরপর ব্যাপার খুব চরমে ওঠে। অফিসের ম্যানেজার অডিটর আসবে বলে কথককে অফিস ছুটির পর সম্পূর্ণ লেজারটা লিখতে বলেন। বেয়ারা খেতে চলে গেলে কথক একাকী লেজার খুলে বসেন- হঠাৎ খট খট শব্দ শুনে চোখ তুলে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখেন। লেখকের ভাষায়,

> "ঠিক অফিসের মাঝখানে একটা কঙ্কাল মূর্তি হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাথায় কালো টুপি। দুটো হাত পিছন দিকে। এদিক থেকে ওদিক আবার ওদিক থেকে এদিক। ঠিক যেমন ভাবে পরীক্ষার সময় গার্ডরা পায়চারি করে, ঠিক তেম। ...কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। হাত অসাড়। লেজারের পাতায় একটি আঁচড়ও পড়ল না। ভাবলাম, চাকরি মাথায় থাক। কোন রকমে বের হতে পারলে আর কোনদিন এ মুখো হব না। কিন্তু যাবার উপায় নেই। ঠিক বের হবার মুখে কঙ্কাল মূর্তি বেড়াচ্ছে। ...ভয়ে ভয়ে জলের গ্লাসটায় চুমুক দিলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছিল। একটু পরেই কঙ্কাল মূর্তি আর দেখতে পেলাম না। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমন হঠাৎই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ...লেজারে কলম ঠেকাতে গিয়েই চমকে উঠলাম। যেটুকু লেখা বাকি ছিল, অচেনা হাতের লেখায় সব ভরতি হয়ে গেছে।"[৩]

পরদিন ম্যানেজার লেজার বইয়ে মৃত প্যারেকের হাতের লেখা দেখতে পেলে কথক গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করেন। অফিসে প্রেতাত্মার উপদ্রব সম্পর্কে ম্যানেজার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে, কথক গয়ায় পিন্ডি দেওয়ার কথা বলেন। গয়ায় পিন্ডি দিলে প্রেতাত্মা চিরতরে মুক্তি পাই। তাই ম্যানেজার উক্ত কাজের সমস্ত দায়িত্ব দেন কথককে। গয়ায় যাওয়ার আগের দিন কথক অফিস থেকে বের হয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক ভয়ানক ঘটনার সম্মুখীন হন। লেখকের ভাষায়,

> "কার একটা হাত আমার কাঁধের ওপর এসে পড়ল। আঙুলগুলোয় যেন এক তিল মাংস নেই, ছুরির ফলা বসানো। আমার কাঁধের মাংস ছিঁড়ে যেতে লাগল। যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম। দেয়ালের কোণে দীর্ঘ এক কঙ্কাল মূর্তি। দুটি চোখে আগুনের শিখা। মাথায় কালো টুপি। এগোবার চেষ্টা করতেই কঙ্কালের দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। ইংরেজিতে হুংকার। গয়ায় পিন্ডি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? এ অফিস থেকে আমাকে সরাবার চেষ্টা? এ অফিসের গোড়াপত্তন থেকে আমি আছি। শেষ অবধি থাকবও। কেউ আমাকে উৎখাত করতে পারবে না। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর হাতের চাপ আরও জোর। মনে হল যেন মাংস ভেদ করে আঙুলগুলো হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। দুঃসহ ব্যাথা। বল, এ দুর্বুদ্ধি ছাড়বি কি না? বল? তোকে খতম করব। না, না, আমি এসব কিছু করব না। আমি আর ঢুকবই না এ অফিসে। প্যারেক, আপনি আমায় বাঁচান।"[৪]

'পাঁচ মুন্ডির আসর' গল্পটিতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় স্বল্প পরিসরে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। গল্পকথক কোর্টের কাজে (সমন ধরিয়ে দেওয়া) লোচনপুর স্টেশনের অন্তর্গত পুবাই গ্রামে যান সর্বেশ্বর জানার কাছে। স্টেশন থেকে কোন যানবাহন না পেয়ে কথক চার মাইল হাঁটাপথে যান। নির্জন রাস্তাঘাট, পায়ে চলা দু-পাশে ঘোড়া নিম আর আশশ্যাওড়ার গাছ- জায়গাটা বেশ অন্ধকার। ছোট্ট গ্রাম, একটি দোকান আর গোটা দশেক চালাঘর- এই গ্রামের সীমানা। কথক সর্বেশ্বর জানাকে কোর্টের সমন ধরিয়ে দিতেই তার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে ওঠে। রাত্রি আসন্ন কিন্তু কোর্টের লোককে আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা, কেউ এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয়নি। কলকাতা যাবার শেষ গাড়ি রাত্রি দশটা বত্রিশে- সেটা অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। অতএব গ্রামে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ হবে না ভেবে কথক স্টেশন অভিমুখে যাওয়ায় ঠিক করেন। চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। গ্রামে আসার সময় যে পথ সরল- মসৃণ মনে হয়েছে, ফেরার সময় আধো অন্ধকারে সে পথেই বার বার হোঁচট খেতে থাকেন। একটু পরে অন্ধকার ঘন হয়। আকাশ চাঁদ হীন। নির্জন পথের দুধারের ঝোপের ফাঁক থেকে শেয়ালের জ্বলন্ত চোখ এবং হুক্কা হুয়া ডাকে কথকের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ঘন্টা খানেক হাঁটার পর কথক বুঝতে পারেন, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। অসহায়- কাতর কণ্ঠে কথক সাহায্যের

জন্য চিৎকার করতে থাকেন। হঠাৎ পিছন থেকে বিকট সুরে শুনতে পান- 'বলো হরি, হরিবোল' শব্দটি। কথক গা ছম ছম করা অবস্থায় অনন্ত পথের যাত্রীকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান এবং মশালের আলোয় চারজন শববাহকের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। লেখকের ভাষায়,

> "...বাহকরা থামল না, শুধু চলার গতি একটু মৃদু করল আর চারজনেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মেরুদন্ড বেয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। ...চারজন লোকেরই ঠিক একরকম চেহারা! এক ধরণের অবিন্যস্ত চুল, রক্তিম চোখ, এমনকি মুখের বসন্তের দাগ পর্যন্ত!"[৫]

শববাহকেরা অনেক দূর চলে গেছে ভেবে কথকও পা বাড়ায় কিন্তু তার কানের কাছে বারম্বার ধ্বনিত হতে থাকে– 'বলো হরি, হরিবোল'। এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলে লোকালয়ের আশায় কথক দৌড়াতে থাকেন কিন্তু সমান তালে কথককে অনুসরণ করতে থাকে– অভিন্ন মূর্তি শববাহকদের বলো হরি, হরিবোল শব্দটি। আধ মাইল প্রাণপণে দৌড়ানোর পর কথক একটি চালাঘর দেখতে পেয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রচন্ড বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পান শব সমেত অভিন্নমূর্তি চারজন বাহক সেখানেই উপস্থিত রয়েছে- যেন কথকেরই প্রতীক্ষা করছিলেন। লেখকের ভাষায়,

> "...চোখাচোখি হতেই চারজন একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। শিকারকে যেন কুক্ষিগত করার উল্লাসে। ... এ হাসি স্বাভাবিক নয়। রক্ত-মাংসের কোন লোক এভাবে হাসতে পারে না। অশরীরী আত্মার বীভৎস হাসি! আমাকে আবার আতঙ্কিত করে একজন খনখনে গলায় বলল- আপনি একটু মৃতদেহের কাছে থাকুন, আমরা কাঠের ব্যবস্থা করে আসি।"[৬]

তারা চলে গেলে কথক সাদা কাপড়ে ঢাকা শবের কাছে থাকেন। আচমকা দমকা হাওয়ায় শবের আবরণ সরে গেলে কথক শবের মুখদর্শন করে চিৎকার করে ওঠেন। কারণ বাহকদের সাথে শবের চেহারা হুবহু এক। ক্রমেই শবদেহ জীবন্ত হয়ে ওঠে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে কথক জ্ঞান হারান। লেখকের ভাষায়,

> "শব চোখ খুলল। রক্তিম দুটি চোখ। প্রথমে দুটো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর খনখনে গলার স্বর ভেসে উঠল। ...ঠিকই ভেবেছ! আমরা পাঁচজন একই লোক। কোন তফাৎ নেই। বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলাম বলে প্রতিবেশীরা কেউ ভয়ে পোড়াতে এল না। দেহের সৎগতি হবে না? তাই নিজের দেহ থেকে চারজন বাহক সৃষ্টি করলাম। তারাই বয়ে নিয়ে এল শ্মশানে। কেমন বুদ্ধি বার করলাম বলো তো? হো, হো, হো!"[৭]

কথকের জ্ঞান ফেরে পথের ধারে কর্দমাক্ত অবস্থায়, বুঝতে পারেন রাত্রির সেই ভয়ানক বিভীষিকা আর নেই। তবে জেলেদের কথা থেকে জানতে পারেন– এ জায়গাটার নাম পাঁচ মুন্ডির আসর, এক রকমের পাঁচজন তেনাদের দেখা যায়। পথ ভুলিয়ে লোককে এখানে নিয়ে আসে। তারপর সাবাড় করে দেয়। কথকের দেহে পৈতা রয়েছে, তাই বেঁচে যান।

লেখকের 'অমর-ধাম' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। এখানে অশরীরী প্রেতাত্মা- নিজেদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য জীবিতাবস্থার বন্ধুদের মিলনপুর অঞ্চলের 'অমর-ধাম' নামক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। গল্পকথক পার্থের শরীর খারাপ হওয়ার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে চেঞ্জে যেতে মনস্থ হন। হঠাৎ বন্ধু অমলের সঙ্গে দেখা হয় এবং তিনিই পার্থকে মিলনপুরে যেতে বলে। পার্থ যথা সময়ে সেখানে পৌঁছালে 'অমর-ধাম' নামক বাড়িটিকে তাঁর ভূতুড়ে বাড়ি প্রতিপন্ন হয়। ডাকাডাকি করতে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে যিনি বেরিয়ে আসেন- তিনি পার্থর কলেজে পড়া বন্ধু পুলক। হঠাৎ একটা কথা স্মরণ করে পার্থর শরীর হিম-শীতল হয়ে যায়। লেখকের ভাষায়,

> "বছর পাঁচেক আগে টালা ব্রিজের কাছে লম্বা পুলক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলক মোটর সাইকেলে ছিল, সামনা সামনি এক লরির সঙ্গে ধাক্কা, পুলক আর তার মোটর সাইকেল, দুইই একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছিল।"[৮]

পার্থ পুলককে তাঁর মৃত্যুর কথা বললে, পুলক তা হেসে উড়িয়ে দেন। এদিকে খাবার টেবিলে পার্থর সঙ্গে পুলক নানা অজুহাতে খাবার খাওয়া এড়িয়ে যেতে থাকে। রাঁধুনি মুংলার অমানুষিক দৈহিক গঠন ও আচরণ পার্থর সন্দেহজনক

মনে হয়। রাত্রে শুতে গিয়ে মাঝরাতে দেখেন তাঁরই বিছানায় একটি কঙ্কাল শুয়ে রয়েছে। প্রচন্ড ভয়ে পার্থ চিৎকার করলে আচমকা সেখানে পুলক উপস্থিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এদিকে পার্থ বুঝে উঠতে পারে না, দোর ভিতর থেকে বন্ধ অথচ পুলক এল কী করে? পার্থ অনুভব করে এ বাড়ির বাতাসে ভয়ের গন্ধ! মনে হয় অশরীরী আত্মারা আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। রাত্রি বেলায় পার্থ এক ভয়ানক শিহরণ জাগানো দৃশ্য দেখেন। লেখকের ভাষায়,

> "ঘুম আসেনি, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ বাইরে খরখর আওয়াজ। ...উঠানে একটা গুঁড়ির ওপর দুটো কঙ্কাল ঘেঁষাঘেঁষি বসে। একজনের হাত আর একজনের গলায়। আর একটু দূরে একটা গাছের ডাল ধরে মুংলা দোল খাচ্ছে। কী লম্বা চেহারা! সারা দেহে কোথাও এক তিল মাংস নেই! চোখের দুটো গর্ত থেকে গাঢ় লাল রঙ বের হচ্ছে। অজান্তেই মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল দুটো ফিরে দেখল। চোখ নেই তবুও কী মর্মভেদী দৃষ্টি! বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল। আশ্চর্য কান্ড! একটু একটু করে কঙ্কাল দুটোই মাংস লাগল। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে দুটি পূর্ণ মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল। ...একজন পুলক, আর একজন অমল।"[৯]

ভোর হতেই পার্থ অমর-ধাম থেকে ছুটতে ছুটতে গিরিডি স্টেশনে পৌঁছান। সেখানের স্টেশন মাস্টারের কাছে শুনেন- দু'বছর আগে অমলবাবুকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় পাওয়া যায়, পুলিশ এই খুনের কোন কিনারা করতে পারেনি। পার্থ ভেবে পাই না- প্রেতাত্মারা তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিল কেন? গলায় পৈতা আছে বলেই কি?

'পিছনের জানালা' গল্পটিতে লেখক এক শিশু ভূতের অবতারণা করেছেন। গল্পকথক চাকরি বদলির কারণে শহরের এক নির্জন স্থানে বাড়ি ভাড়া নেন। সেখানের কর্মচারীরা কথককে রান্না ঘরের পিছনের জানালাটা খুলতে নিষেধ করেন। কথক ব্যাপারটি সম্পর্কে জানতে চাইলে, সকলেই এড়িয়ে যায়। অগত্যা কথক একদিন জানালাটা খুলে দেখতে পান- একটি শিশুর কবর। এরপর নানা ধরণের ভূতুড়ে কান্ড ঘটাতে থাকে ঐ শিশুর প্রেতাত্মাটি। অবশেষে কথক এক রাতে নিজেকে আবিস্কার করেন ঐ শিশুটির কঙ্কালের সাথে কবরে শুয়ে রয়েছেন। লেখকের ভাষায়,

> "রাত তখন ক-টা জানিনা। গলায় খুব ঠান্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে জেগে উঠলাম। ...সেই শিশুটি এক হাত দিয়ে আমার গলা আঁকড়ে ধরে শুয়ে রয়েছে। সবলে শিশুটিকে সরিয়ে দিতে চাইলাম, পারলাম না। ...শিশুর দেহের মাংস আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে একটা কঙ্কাল বিছানায় শুয়ে। একভাবে হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে রয়েছে। হাড়ের দৃঢ় বাঁধন।"[১০]

'আমরা আছি' গল্পটি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শণ। ভূত আছে কি নেই? সেই বিশ্বাস- অবিশ্বাসের সন্ধিস্থলে দুই বন্ধুর মধ্যে মেলবন্ধনের কাজ করেছে দশ দিন পূর্বে মৃত এক জীবন্ত প্রেত। গল্পকথক যেখানেই ভূতের অস্তিত্বের সংবাদ পেয়েছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন– সত্যতা যাচাই করতে। অবশেষে বুঝতে পেরেছেন- সব কিছুই চোখের ভুল, ভূতের কাহিনি মানুষের কল্পনা। হঠাৎ একদিন একটা চিঠি পান কথক- বন্ধু শৈলেনের প্রেরিত। চিঠিতে লেখা রয়েছে- যদি ভূত দেখতে চাও, অবিলম্বে ঘাটশিলায় আমার কাছে চলে এস। অগত্যা কথক সুটকেশ, বিছানা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে হাজির হলে, কথককে চমকিত করে শৈলেন সেখানে উপস্থিত হন। শৈলেনের তখন ঘাটশিলায় থাকার কথা। যাইহোক, ট্রেনে উঠে দুই বন্ধু ভূত প্রসঙ্গে, কর্ম-কাজ সম্পর্কে নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ট্রেন ঘাটশিলা স্টেশনে পৌঁছায়। শৈলেন গল্পকথককে তাঁর ডেরার অবস্থান জানিয়ে, স্টেশনে অপেক্ষা করতে বলে, সাইকেল-রিকশা ডাকতে চলে যান। এদিকে প্রায় আধ ঘন্টা পার হলেও শৈলেন এলো না দেখে, অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে কথক স্টেশন থেকে বাইরে এসে একজন রিকশা-ওয়ালাকে রঙ্কিনীদেবীর মন্দির যেতে বলেন। কথক শৈলেনের এরূপ ব্যবহারের একটিই কারণ খুঁজে পান- পূর্বেই ঘরে পৌঁছে ভূতজনিত কোন ফন্দি আঁটা। অবশেষে রঙ্কিনীদেবীর মন্দিরের পাশে শৈলেনের একতলা ভাড়া বাড়িতে পৌঁছান কথক। দরজা ঠেলতেই খুলে যায়- ঘরের ভেতরে জমাট অন্ধকার। কথক সুটকেশ খুলে টর্চ বার করে আলো ফেলতেই চিৎকার করে উঠেন। লেখকের ভাষায়,

> "মেঝের ওপর শৈলেন পড়ে রয়েছে! চিৎ হয়ে। দুটি চোখ বিস্ফারিত। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। দু-কষ বেয়ে রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে! তার দেহে যে প্রাণ নেই- এটা বোঝবার জন্য কাছে যাবার দরকার হল

না। মনে হল কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে। তখনও টর্চের আলো শৈলেনের দেহের ওপর। তার শরীর ঘুরে গেল। কে যেন ঘুরিয়ে দিল দেহটাকে। চোখ দুটো আরও বিস্ফারিত! গালের মাংসপেশিগুলো তির তির করে কাঁপছে!"[১১]

এদৃশ্য দেখার পর কথকের পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। তাই তিরবেগে ছুটে রাস্তার ওপর পড়েন- ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর ছুটছিল, আর একটু হলেই মোটরের তলায় পড়তেন। মোটর চালক ছিলেন একজন বাঙালি ডাক্তার। কথকের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে ডাক্তার আশ্চর্য হন। লেখকের ভাষায়,

"শৈলেনবাবু তো আজ দিনদশেক হল মারা গেছেন। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু। গলা টিপে কারা মেরে রেখে গেছে। ...বাড়িটার খুব বদনাম আছে। এর আগেও দুজন এভাবে মারা গেছেন। কিন্তু আপনি দেখলেন কী করে? পুলিশ তো দরজায় তালা দিয়ে গেছে।"[১২]

ডাক্তারের কথা শুনে কথক দরজায় টর্চের আলো ফেলতেই চমকে ওঠেন- দরজায় বিরাট আকারের দুটি তালা ঝুলছে। ডাক্তার কথককে স্টেশনে পৌঁছে দেন। প্ল্যাটফর্মের চেয়ারে বসে কথক ভাবেন– যে লোকটা দশ দিন আগে মারা গেছে, সে হাওড়া থেকে ঘাটশিলা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে, নিজের মৃতদেহ দেখাবার জন্য– এমন আজগুবি কথা কে বিশ্বাস করবে? এমন সময় কথকের কানের পাশে শৈলেনের মৃদুকণ্ঠ শোনা যায়– 'আমরা আছি, আমরা আছি, অবিশ্বাস করো না।'

'কুপার সাহেবের বাংলো' গল্পটিতে লেখক ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে অশরীরীর আগমন ঘটিয়েছেন। গল্পকথক প্রচন্ড শীতের রাতে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বাংলো ভ্রমে কবরের উপর শুয়ে পড়েন। অতঃপর ফ্ল্যাশব্যাকে এক অলৌকিক নারকীয় হত্যাকান্ডের সাক্ষী হন। খ্রিষ্টান মেয়ে জোয়ান স্থানীয় কারখানার ম্যানেজার হালদারের সাথে পরকীয়ায় দিনের পর দিন মজে থাকেন। এই কাজে ডরোথি তাকে সহায়তা করে। জোয়ানের স্বামী আর্থার সমস্ত খবর পান। আর্থার একদিন হাতে-নাতে জোয়ানকে ধরলে- রিভলবার দিয়ে দুই বান্ধবীকেই মার্ডার করেন। লেখকের ভাষায়,

"একটি যুবতীকে টানতে টানতে একজন যুবক প্রবেশ করল। ...যুবতীর সাজ পোশাক দেখে লজ্জা পেলাম। পাতলা ফিনফিনে একটা স্কার্ট পরনে। ভেতরে আর কোন আবরণ নেই। ...যুবক সজোরে যুবতীকে একটা লাথি মারল। যুবতী সামলাতে না পেরে কৌচ থেকে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ল। পোশাক সরে গিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ একেবারে অবারিত। বিচ, তোর এই পাপমুখে যিশুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিস না! যে লোকটা পালাল, সে কপার কারখানার ম্যানেজার হালদার, তা আমি জানি। ...দেখো, ডাক্তার সেনের রিপোর্ট। আমি কোনদিন সন্তানের জন্ম দিতে পারব না। গত যুদ্ধ আমার এই সর্বনাশ করেছে। অপারেশন করে গুলি বের করার সময়ে আমার পৌরুষত্ব হরণ করেছে। কাজেই যেটা তোর পেটে এসেছে, সেটা নেটিভ হালদারের দান। ...শয়তানি, আজ তোর শেষ দিন!"[১৩]

এই গল্পের কাহিনি নির্বাচনে এবং এক অভিনব পদ্ধতিতে ভূতের আগমন ঘটিয়ে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে নিজের জাত চিনিয়েছেন।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মূর্তির কবলে' গল্পটিতে ভয় এক অন্য রূপে দেখা দিয়েছে। কথক কর্মসূত্রে কলকাতা থেকে অন্ধ্রদেশে যান। সেখানের ভাড়া বাড়িতে একটি কালভৈরবীর মূর্তি দেখতে পান। কথক নাস্তিক, তাই মূর্তিটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতে পারেননি। তাই রাত্রিবেলায় মূর্তিটি কথককে ভয়ানক- বিকট চেহারায় জীবন্তরূপে দেখা দেয়। লেখকের ভাষায়,

"রাত্রি কত খেয়াল নেই। হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। মশারিতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ...সেই অগ্নিশিখার পিছনে বিরাট এক মূর্তি। শুধু বিরাট নয়, বিকটও। কালভৈরবীর মূর্তি। দুটি চোখে অগ্নিপিন্ড, ঠোঁটের দুপাশে আগুনের ঝলক। ...এদিকে আগুনের উত্তাপ বাড়ছে। বিছানার ওপর বসে থাকা আর

> সম্ভব নয়। লাফিয়ে মেঝের ওপর পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেন মিলিয়ে গেল। কালভৈরবীর মূর্তিও উধাও।"[১৪]

সকালে কথক তাকের ওপর মূর্তিটিকে দেখতে না পেয়ে ঘরময় খুঁজতে থাকেন, অবশেষে আলনায় রাখা জুতোর কাছে মূর্তিটি পান। গৃহ পরিচারক শঙ্করণ মূর্তিটা ভালো করে কাপড়ে মুছে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যথাস্থানে স্থাপিত করেন। উক্ত ঘটনার এক মাস পর কথকের বন্ধু অসিত বেড়াতে এসে মূর্তিটিকে ফেলে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে- সেই রাত্রিতে অসিতকে আর জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায়নি।

'গভীর রাতের কান্না' গল্পটিতে লেখক একজন নারীমূর্তি রূপী কঙ্কালের অবতারণা করেছেন। আনন্দ ও প্রদীপের মধ্যে ভূত-প্রেত সম্বন্ধে কথাবার্তার সময় প্রদীপ তাঁর ব্যবসায়ী জীবনের একটি ঘটনা ব্যক্ত করেন। আলিপুরদুয়ারে কাঠের ব্যবসা সম্পর্কিত কাজ সম্পূর্ণ করে স্টেশনে ফেরার পথে প্রবল বৃষ্টির সম্মুখীন হন, ফলে আশ্রয়ের সন্ধানে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিছু সময় পার হওয়ার পর- একটি মেয়ের একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। কথক প্রদীপ মেয়েটির সন্ধানে বের হলে, নাকীসুরে মেয়েটি প্রদীপকে টর্চের আলো বন্ধ করতে বলেন। এরপর মেয়েটি কথককে নিজের অতীত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রনার এবং তাকে হত্যা করার কথা বলেন। প্রদীপ বুঝতে পারেন– মেয়েটি প্রেতাত্মা। মেয়েটি নিজের মুক্তির জন্য কথককে গয়ায় পিন্ডি দিতে বলেন। মেয়েটি নিজের নাম ও খরচ বাবদ একখানি সোনার হার দেয়। এবং কথককে সাবধান করে দেয়- যদি গয়ায় পিন্ডি না দেওয়া হয়, তাহলে তার ঘাড় মটকাবেন। গভীর রাতে বৃষ্টি থামলে মেয়েটি কথককে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেন। ভোরের আলো ফুটে উঠলে কথক প্রদীপ পিছু ফিরে দেখেন- একটি নরকঙ্কাল। লেখকের ভাষায়,

> "স্টেশনের কাছাকাছি একটা জঙ্গল। সেখানে আসতেই ভোর হয়ে গেল। পেছন থেকে মেয়েটি বললে, আমি আর যেতে পারব না সকাল হয়ে গেছে। তারপর আমি পিছন ফিরে দেখি, একটা নরকঙ্কাল যাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর দেখতে! আমার সারা দেহ তখন কাঁপছে। ওঃ এরই সঙ্গে আমি কাল সারারাত একটা নোংরা বাড়িতে বন্দি ছিলাম।"[১৫]

মৃত্যুর পরও জীবিতাবস্থার আত্মীয়দের প্রতি টান সমভাবে থেকে যায়, সে কাহিনিটিই ব্যক্ত করেছেন লেখক 'টান' গল্পটিতে। গল্পকথক সমর দীর্ঘদিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করার তাগিদে লখনউ যান পিসিমার বাড়ি। কিন্তু মাঝপথে একটি অপরিচিত বছর আটেকের মেয়ে কথককে ট্রেন থেকে নামিয়ে, ট্রেনটি মিশ করিয়ে দেন। সাথে সাথে মেয়েটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছুসময় পর কথক খবর পান লখনউগামী ট্রেনটিতে ভয়ানক এক্সিডেন্ট হয়েছে এবং প্রচুর মানুষ মারা গেছে। কথক বুঝতে পারেন অপরিচিত ঐ মেয়েটি কথককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন পর কথক পিসিমার বাড়ি গিয়ে দেখেন টেবিলে রাখা ঐ অপরিচিত মেয়েটির ফটোগ্রাফ। পিসিমাকে জীজ্ঞেস করতেই কথক জানতে পারেন, মেয়েটি তাঁরই পিসতুত বোন, কথকের জন্মের পূর্বেই মেয়েটি মারা যায়।

মৃত্যুর পরেও পরলোকগত আত্মার বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি থাকে- তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শণ লেখকের 'প্রতিহিংসা' গল্পটি। ঘটনাটি চল্লিশ বছর আগের- যা কথক আজও স্মরণ করে শিহরিত হয়ে ওঠেন। গল্পকথক ও তার সহপাঠী পশুপতি সামন্ত দশম শ্রেণীর ছাত্র। কথক অঙ্ক বিষয়ে সেরা ছাত্র ছিলেন কিন্তু ইতিহাসে তথৈবচ। অন্যদিকে পশুপতি ইতিহাসে সেরা ছাত্র কিন্তু অঙ্কে গোল্লা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কথকের পেছনের বেঞ্চে বসেন পশুপতি। অঙ্ক পরীক্ষার দিন পশুপতি কথককে অনুরোধ করলেও কথক একটিও অঙ্ক দেখায়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আধ ঘন্টা পূর্বেই খাতা জমা দিয়ে পশুপতি রেলে কাটা পড়ে আত্মহত্যা করে। পরদিন ইতিহাস পরীক্ষা, কথকের অবস্থা শোচনীয়। পশুপতির আত্মহত্যার সংবাদ কথক পাননি। রাত্রি নয়টার সময় পশুপতির আত্মা কথকের সামনে উপস্থিত হয়ে ইতিহাসের ভুল-ভাল প্রশ্ন বলেন। যেগুলি কি না কালকের পরীক্ষায় আসবে। ফলে সারারাত ধরে কথক সে প্রশ্ন গুলির উত্তর তৈরি করেন কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখেন সে প্রশ্ন গুলির একটিও আসেনি। পরীক্ষা শেষ হলে অপর এক বন্ধুর কাছ থেকে কথক জানতে পারেন- গতকাল পশুপতি ট্রেনে কাটা পড়েছে। সুতরাং কথক বুঝতে পারেন পশুপতির আত্মা গতকাল রাত্রিতে এসে চরম প্রতিশোধ নিয়েছে।

'ফাঁসির আসামি' গল্পটি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনি। গল্পটির পটভূমি উত্তর বর্মার প্রধান শহর ম্যান্ডেল। কথক ম্যান্ডেল জেলের ডেপুটি সুপার। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র পে মঙ-কে নিজের ভাইয়ের হত্যার অপরাধে জেলা জজ মিস্টার বেকারের এজলাসে ফাঁসির শাস্তি হয়। পুলিশ, আদালত এবং জেলে থাকাকালিন পে মঙ বার বার বলতে থাকেন তিনি নির্দোষ। কিন্তু কেউ শুনেনি তার কথা। নির্দিষ্ট দিনে তাঁর ফাঁসি হয় কিন্তু ফাঁসিকাঠে ঝুলবার আগে সে প্রতিজ্ঞা করে যায়- প্রতিশোধ নেওয়ার। লেখকের ভাষায়,

> "আমাকে বিনাদোষে যারা ফাঁসি দেবে, তাদের আমি ছাড়ব না। আমি শয়তানের কাছে রক্ত বিক্রি করে যাব। আমার আত্মা প্রতিশোধ নেবে।"[১৬]

ফাঁসির দুই দিন পর কথকের কোয়ার্টারে উপস্থিত হয় পে মঙ-এর প্রেতাত্মা। কথক প্রচন্ড ভয়ে ভয়ে তার আগমনের কারণ জানতে চান। লেখকের ভাষায়,

> "আমি নির্দোষ হুজুর। এ খুন আমি করিনি। এখন আর এসব কথা বলে লাভ কী? তোমার তো যা হবার হয়ে গেছে। আছে হুজুর। পরকাল আছে, সেখানে আমি শান্তি পাচ্ছি না। ...সেদিন ভাইকে খুন করতে আমি চাইনি হুজুর। পিছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টাকাপয়সা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম। দুজনে রাস্তার ওপর যখন গড়াগড়ি খাচ্ছি তখন পাশের ঝোপ থেকে একজন লাফিয়ে বের হল। আমার কোমর থেকে ছোরাটা বের করে আমার ভাইয়ের বুকে বার কয়েক বসিয়ে দিল। আমাকেও হয়তো মারত কিন্তু দারোগার সাইকেল দেখতে পেয়ে আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ...ঠিক আছে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। পে মঙের বীভৎস রক্তাক্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল। করলেন তো হুজুর, তাতেই আমার শান্তি। ...যাচ্ছি হুজুর, তবে যারা আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের আমি ছাড়ব না।"[১৭]

কথক পরের দিন খবরের কাগজে দেখেন- জেলা জজ বেকার নিহত। পুলিশ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে এই রহস্যময় হত্যাকান্ডের মীমাংসা করার জন্য। কিন্তু কথক বুঝতে পারেন, পে মঙের প্রেতাত্মাই জেলা জজের মৃত্যুর কারণ।

'ভূতুড়ে কান্ড' গল্পটিতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন অশরীরী প্রেতাত্মার দেহপ্রাপ্তি এবং তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ভৈরব রোজার নানা কেরামতি। কথকের মেজোমামা প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ভোরবেলা মাছ ধরতে যান, এদিকে পথেই গাছের ডাল পড়ে মেজোমামার মৃত্যু হয়। গাছটিতে থাকত মহিন্দর ডোমের প্রেতাত্মা, বামুনের মৃতদেহ পেয়ে তাতে ঢুকে পড়ে। অতঃপর মেজোমামার চেহারা ধারণ করে বিকাল বেলা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বাড়ি ফেরে। ধীরে ধীরে মেজোমামার রহস্যময় ভূতুড়ে আচরণ কথক তথা বাড়ির সকলেই প্রত্যক্ষ করে শিহরিত হয়ে ওঠে। অগত্যা ডাক পড়ে বদনপুরের বিখ্যাত ভৈরব রোজার, যার খড়মের আওয়াজে ভূত-প্রেত থরথর করে কাঁপে। ভৈরব রোজা মন্ত্র আওড়ানো শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই মেজোমামা ভয়ানক রূপ নিয়ে হাজির হয়। লেখকের ভাষায়,

> "পশ্চিমদিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজোমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি। বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ছটফট করছে! মেজোমামার দু-কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে!"[১৮]

এরপর শুরু হয় প্রেতে-মানুষে জিজ্ঞাসাবাদ। ভৈরব ঝাঁটা আছড়িয়ে মেজোমামাকে যন্ত্রণা দিতে দিতে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, কে তুই? তোর আসল পরিচয় কী? মেজোমামারূপী প্রেত আর্তনাদ করতে করতে সমস্ত ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। লেখকের ভাষায়,

> "আমি মহিন্দর ডোম। ...সেদিন খুব ঝড়-জলের সময় দয়াল সাইকেল চেপে বট গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই আমার আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়ে দয়ালের মাথার ওপর। দয়াল খতম। তার সাইকেল চিঁড়েচ্যাপ্টা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া। অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুড় সুড় করে ঢুকে পড়লাম। ...এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে। ...গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে। ...ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব। এদিকে আর আসব না।"[১৯]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 'আরণ্যক' গল্পটিতে একটি প্রেত চিতাবাঘের অবতারণা করেছেন। গ্রামবাসীদের মতে সে চিতা নয়-প্রেত। কথক দশ বছর আগে খুরশীদগড়ের জঙ্গলে একটি চিতা শিকার করে গ্রামবাসীদের সাহায্য করেছিলেন। চিতাবাঘটির বিশেষত্ব একটি কান নেই এবং দেহের এক পাশে লোম নেই। দশ বছর পর আবার সেই চিতাবাঘটিরই সম্মুখীন হতে হয় কথককে। গুলি মারার পরও চিতাবাঘটির মৃত্যু হয় না- বার বার কথককে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিতে থাকে। অবশেষে গ্রামবাসীদের মত কথককেও মেনে নিতে হয়- এ কেবল চিতা নয়, চিতাবাঘের অশরীরী প্রেতাত্মা।

'রাতের প্রহরী' গল্পটি লক্ষ্ণৌ শহরের পটভূমিতে রচিত। গল্পটি কথকের অমিয়া মাসির জীবনে ঘটে যাওয়া একটি রহস্যময় ভয়ানক ঘটনা। অমিয়া মাসি ও মেসো শারীরিক সুস্থতার খাতিরে লক্ষ্ণৌ শহরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যান। যে বাড়িতে আশ্রয় নেন-সেটি অতি প্রাচিন, তাঁর দাদু বানিয়েছিলেন। বাড়িতে প্রবেশের সাথে সাথেই আবদুল রিজভি নামক একটি লোক রাত্রিতে বাড়ি পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলে- তাকে মেসো রেখে নেন। দিনের বেলায় বাড়িটি সাধারণ মনে হলেও রাত্রিবেলায় গা ছমছম করে, মনে হয় তৃতীয় কোন সত্ত্বার উপস্থিতি। মাসি-মাসো রাতের পর রাত ঘটে যাওয়া অলৌকিক সবকিছুকেই মনের ভুল বলে মেনে নেয়। কিন্তু একদিন মধ্যরাত্রিতে মাসি ভয়ঙ্কর একটি জীবন্ত নরকঙ্কাল দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। লেখকের ভাষায়,

> "একেবারে দেয়াল ঘেঁষে একটি নরকঙ্কাল! বললে বিশ্বাস করবে না, জীবন্ত নরকঙ্কাল! দুটো হাত প্রসারিত করে আমাকে ডাকছে। শুধু ডাকা নয়, খল খল করে হাসি। অদ্ভুত মারাত্মক হাসি। তার শব্দে শরীরের সমস্ত রক্ত পলকে যেন জমাট বেঁধে যায়।"[২০]

স্থানীয় বাঙালি ডাক্তার মাসির চিকিৎসার জন্য এসে বলেন- আপনার দাদুকে আমরা এখানে বাড়ি তৈরি করতে বারণ করি, কারণ এখানে আবদুল রিজভি নামক একটি লোকের কবর ছিল। কথাটা শুনে মাসি-মাসো আর এক মুহূর্ত দেরী করেননি বাড়িটি ছাড়তে, কারণ এতদিন তারা বহুকাল পূর্বে মৃত আবদুল রিজভির সাথে বাস করছিলেন।

'বনকুঠির রহস্য' গল্পটিতে লেখক তোঙ্গাগাছের মধ্যে অপদেবতার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। স্থানীয় বিশ্বাস মতে তোঙ্গাগাছে অপদেবতার বাস। গল্পকথকের বন্ধু সুকুমার ওড়িশ্যার কটক শহরের সারানার জঙ্গলে কাঠ চালানের ব্যবসা করত। কর্মচারীদের বারণ সত্ত্বেও সুকুমার নিজ হাতে তোঙ্গাগাছ কাটলে- তিনদিনের মাথায় তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

'বেনেটির জঙ্গলে' গল্পটিতে লেখক এক ব্রহ্মদৈত্যের আগমন ঘটিয়েছেন। কথক কর্মোপলক্ষে আতাপুর যান, সেখানে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার কারণে রাত্রিবাসের জন্য নন্দীপুরে যাওয়া মনস্থ করেন। কিন্তু পথে পড়ে বেনেটির জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন শ্মশান। কথক নির্ভীক। কিন্তু জঙ্গল পার হওয়ার সময় একটি বটগাছের ডালে বিরাট নরকঙ্কালের পা কথকের মাথায় বার বার ঠেকে যেতে থাকে। নরকঙ্কালটি কথককে কিছু বলতে চাইলে, কথক প্রাণপণে প্রচন্ড ভয়ে ছুটতে থাকেন এবং নরকঙ্কালের আতঙ্কে জ্ঞান হারান। অবশেষে জ্ঞান ফিরলে সুনন্দবানু জানান- তিনি দুর্লভ চক্রবর্তীর পাল্লায় পড়েছিলেন। যিনি অপঘাতে মৃত্যুর কারণে বটগাছটিতে ব্রহ্মদৈত্যতে পরিণত হয়েছেন। ঐ জঙ্গলের পথে কোন বামুন মানুষকে দেখলেই গয়ায় পিন্ডি দেওয়ার কথা বলে- যাতে তিনি মুক্তি পান।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ভৌতিক কাহিনি হল 'বিনোদ ডাক্তার'। কথক কর্মোপলক্ষে বিরামপুরে গিয়ে রাত্রিবেলায় প্রচন্ড পেট ব্যাথার কারণে বিনোদ ডাক্তারের কাছে যান। মাত্র পাঁচ মিনিটে কথকের অম্লশূল সারিয়ে দেন বিনোদ ডাক্তার। কথক বিনোদ ডাক্তারকে টাকা দিতে চাইলে, প্রচন্ড ধমক দিয়ে জানান তিনি টাকা নিয়ে চিকিৎসা করেননা। অন্য একদিন রাতে কথক বিনোদ ডাক্তারের সাথে দেখা করতে গিয়ে বিনোদ ডাক্তার সমেত চারটি কঙ্কালের ভয়ানক একটি দৃশ্য দেখে কথক বিরামপুর ছেড়ে পালায়। লেখকের ভাষায়,

> "টেবিলের ওপর একটা কঙ্কাল শুয়ে। বিনোদ ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে করতে বলছে, মগ ডালে ডালে বেড়িয়ো না, তোমার বুকের হাড় খুবই দুর্বল। কোনদিন মট করে ভেঙ্গে যাবে। প্লাস্টার

করে শুইয়ে রাখবো, তখন মজাটা টের পাবে। বিনোদ ডাক্তারের কথা শুনে কঙ্কালটার সে কী হাসি! ওপরের দিকে চেয়ে দেখি একটা কঙ্কাল শূন্যে দোল খাচ্ছে। বিনোদ ডাক্তার তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলল, রোজ এই রকম ব্যায়াম করবি, তবে দেহ মজবুত হবে। হঠাৎ হাসির শব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, কোণের দিকে বেঞ্চের ওপর বসে একটা কঙ্কাল শিশি থেকে বড়ি নিয়ে অনবরত মুখে ফেলছে আর হাসছে। অদ্ভুত হাসি। ঠিক দুটো হাড়ে ঠোকাঠুকি করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। কঙ্কালটা হাসতে হাসতেই বলল, বিনোদ ডাক্তার তোমার চোগা চাপকান খুলে আমাদের মতন হালকা হও দেখি। তোমার গরমও লাগে না।"[২১]

'রাত গভীর' গল্পটিতে লেখক একটি ভূতুড়ে মিনিবাসের প্রকল্পনা করেছেন। কথক মধ্যরাতে একটি মিনিবাসে ওঠেন, কন্ডাকটরের কাছে টিকিট নেন এবং ক্লান্তির কারণে শুয়ে পড়েন। তিন ঘন্টা পর ঘুম ভাঙলে কথক দেখেন বাস ঝড়ের গতিতে চলেছে কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছায়নি দেখে সন্দেহ হয়। ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেন- একটি পৈতাধারী কঙ্কাল গাড়ি চালাচ্ছে। কন্ডাকটরের দেখা নেই। হঠাৎ গাড়িতে একে একে এমন সব মানুষের আবির্ভাব ঘটতে থাকে- যাদের মৃত্যু হয় বাসে চাপা পড়ে। কথক তাদের অনেককেই চিনতেন। হঠাৎ বামুন ড্রাইভারের জাত্যাভিমানকে কেন্দ্র করে ড্রাইভার ও কন্ডাকটরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। সেই ঝগড়ায় কথক ব্যতিত সকলেই যোগদান করে। ধীরে ধীরে বাসের সকলেই কঙ্কালের রূপ নিলে শিহরণ জাগানো, ভয়ঙ্কর এক নারকীয় কান্ড শুরু হয়। হঠাৎ কথকের মনে হয় কেউ যেন বাসটিকে দুহাতে তুলে আছাড় মারে। কথক মূর্ছিত হয়ে বাসের বাইরে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরলে কথক বুঝতে পারেন তিনিও ভূতুড়ে বাসটির আর সকলের মত কঙ্কালে পরিণত হয়েছেন।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হল- তার ভূতের গল্পে হাস্যরস নেই, ফলে তার ভূতেরা তথাকথিত বীভৎস চেহারা নিয়ে হাজির হয়। 'অলৌকিক' গল্পটিতে অফিস অন্তঃপ্রাণ এক কঙ্কাল, কথককে নারকীয় আক্রমণে অফিসছাড়া করে ছেড়েছে। 'পাঁচ মুন্ডীর আসর' গল্পটিতে একই চেহারার পাঁচটি ভূত দলবদ্ধ ভাবে কথককে ভয় দেখিয়েছে। লেখকের ভৌতিক গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট– ভূতেরা ব্রাক্ষ্মণদের প্রাণে মারতে পারে না, কেবল ভয় দেখাতে পারে। 'অমর ধাম' গল্পটিতে ভূতেরা নিজেদের দল বাড়ানোর জন্য জীবিত মানুষ মারার চেষ্টা করেছেন। 'পিছনের জানালা' গল্পটিতে লেখক একটি শিশুভূতের অবতারণা করেছেন। 'আমরা আছি' গল্পটিতে ভূত জীবিতাবস্থার এক বন্ধুকে নিজের শবদেহ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন-ভূত আছে। 'কুপার সাহেবের বাংলো' গল্পটিতে লেখক দুটি খ্রিষ্টান মেয়েদের ভূতের আগমণ ঘটিয়েছেন। 'মূর্তির কবলে' গল্পটিতে লেখক একটি অলৌকিক মুর্তির উপস্থাপন করেছেন। লেখকের ভৌতিক গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট- ভূতেরা নিজেদের মুক্তির জন্য মানুষদের কাছে গয়ায় পিন্ডি দেওয়ার আব্দার করেছে। এইরূপ দুটি গল্প হল-'গভীর রাতের কান্না' ও 'বেনেটির জঙ্গলে'। 'ফাঁসির আসামি' গল্পটিতে ভূত বাস্তব জগতে এসে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছে। 'ভূতুড়ে কান্ড' গল্পটিতে লেখক ভূতেদের ওঝা ভৈরবকে সৃষ্টি করেছেন এবং ভূতুড়ে কান্ডের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। 'আরণ্যক' গল্পটিতে লেখক একটি বেঘোভূতের অবতারণা করেছেন। 'বনকুঠির রহস্য' গল্পটিতে লেখক একটি গাছের মধ্যে ভূত দেখিয়েছেন। 'বিনোদ ডাক্তার' গল্পটিতে লেখক চিকিৎসক ভূতের অবতারণা করেছেন। 'রাত গভীর' গল্পটিতে লেখক একটি ভূতুড়ে বাসের সৃষ্টি করেছেন। ভূত আছে কি নেই ? এ প্রশ্নের মীমাংসা হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় করে দিয়েছেন,

> "যুক্তির আতশ কাচ দিয়ে সবকিছুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন আছে, তেমনি আছে অতীন্দ্রিয় জগৎ। সে জগতে সবকিছু বিচিত্র, সবকিছু যুক্তির মাধ্যমে যাচাই করা চলে না। এই অতিপ্রাকৃত জগৎকে গায়ের জোরে অস্বীকার যারা করে, তারা পৃথিবীর বারো আনা রহস্যের খোঁজ পায় না। অনেক সময় আমরা মনকে বোঝায় এসব চোখের ভুল, মনের ভুল, যা ঘটেছে নিছক কল্পনা অথবা মনের তৈরি মায়া, কিন্তু সঙ্গোপনে নিজের মনের মুখোমুখি যখন বসি, তখন এসব অবজ্ঞা করা দুরূহ হয়ে ওঠে।"[২২]

বাংলা সাহিত্যে ভয়ঙ্কর ভূত এবং রোমহর্ষক ভৌতিক কাহিনি সৃষ্টিতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। তাঁর ভোতিক গল্পগুলির রস চিরকালীন। ভৌতিক পরিবেশ নির্মাণে, রচনাশৈলীর অভিনবত্বে তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয়-রহস্যময় জগতের প্রবেশদ্বার।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, ভয় সমগ্র, অলৌকিক, বুক ফার্ম, ৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৮
২. তদেব, অলৌকিক, পৃ. ৯
৩. তদেব, অলৌকিক, পৃ. ১০,১১
৪. তদেব, অলৌকিক, পৃ. ১২,১৩
৫. তদেব, পাঁচ মুন্ডীর আসর, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পাঁচ মুন্ডীর আসর, পৃ. ১৮
৭. তদেব, পাঁচ মুন্ডীর আসর, পৃ. ১৯
৮. তদেব, অমর-ধাম, পৃ. ২২
৯. তদেব, অমর-ধাম, পৃ. ২৪,২৫
১০. তদেব, পিছনের জানলা, পৃ. ২৯
১১. তদেব, আমরা আছি, পৃ. ৩৯, ৪০
১২. তদেব, আমরা আছি, পৃ. ৪০
১৩. তদেব, কুপার সাহেবের বাংলো, পৃ. ৫৬, ৫৭, ৫৮
১৪. তদেব, মূর্তির কবলে, পৃ. ৭১, ৭২
১৫. তদেব, গভীর রাতের কান্না, পৃ. ৯৪
১৬. তদেব, ফাঁসির আসামি, পৃ. ১৪৩
১৭. তদেব, ফাঁসির আসামি, পৃ. ১৪৬
১৮. তদেব, ভূতুড়ে কান্ড, পৃ. ১৬৮
১৯. তদেব, ভূতুড়ে কান্ড, পৃ. ১৬৮, ১৬৯
২০. তদেব, রাতের প্রহরী, পৃ. ১৮৪
২১. তদেব, বিনোদ ডাক্তার, পৃ. ২১২
২২. তদেব, আরণ্যক, পৃ. ১৭০

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ভয় সমগ্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বুক ফার্ম, ৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১৯
২। অলৌকিক সমগ্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- পৌষ ১৪২৬, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৮
৩। ভৌতিক গল্পসমগ্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৪, পঞ্চম মুদ্রণ- অক্টোবর ২০১৭
৪। তারা অশরীরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০১, পুনর্মুদ্রণ- জুন ২০১৭
৫। সব ভুতুড়ে, লীলা মজুমদার, সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮৩, প্রথম সিগনেট সংস্করণ জুন ২০১৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ- জুলাই ২০১৬
৬। শরদিন্দু অমনিবাস (পঞ্চম খন্ড), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- ভাদ্র ১৩৮২, ষড়বিংশ মুদ্রণ- মাঘ ১৪২৫